চিংড়ির মরা খামার ঃ বিপর্যস্ত চরজীবন

রিয়াজ উদ্দিন খান

চিংড়ি ঘের এর সুদুরপ্রসারী ফলাফল হিসাবে একটি ভারসাম্যহীন, রুক্ষ, রুগ্ন পরিবেশ তৈরি হয়েছে নোয়াখালীর চরাঞ্চলে। বিপন্ন পরিবেশে বিপর্যপ্ত হয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকা, নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার চর বাগ্গা, চর বৈশাখী, চরকেলার্ক, চর জব্বার, চর মজিদ, চর ওয়াপদা, চর ধানের শীষ এরকম কয়েকটি চর এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে এবং স্থানীয় লোকজনের সংগে কথা বলে এলাকার পরিবেশ ধ্বংসের চিত্রটি জানা যায়। নানাবিধ কারণে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস হতে পারে। তবে বিভিন্ন অনুসন্ধানে ত্রুটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নোয়াখালীর চরাঞ্চলে পরিবেশ ধ্বংসে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে চিংড়ি ঘের।

৯০ দশকের প্রথম থেকে এলাকায় চিংড়ি চাষ শুরু হয়। এবং চিংড়ি চাষের জমি হিসাবে প্রথম থেকেই বেছে নেয়া হয় নদীর দুই কূলকে। এক পর্যায়ে কোথাও কোথাও দখল করে নেয়া হয় আস্ত নদী। নদীর দুই পাড়ে লম্বালম্বি বাঁধ দিয়ে গড়ে তোলা হয় বড় বড় চিংড়ি ঘের। এছাড়াও চিংড়ি চাষের জন্যে বেছে নেয়া হয় ফসলী জমি, বন বিভাগের অনেক কষ্টেগড়া বনভুমি। এভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি চিংড়ি ঘের। যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হিসাবে ঘটছে দুটো বড় ঘটনা।

০১. ঘের এবং তার আশ-পাশের এলাকার জমির চরিত্র বদল, মাটির গুণাগুণ পরিবর্তন। যার ফলে এখানে আর অন্য কোনো ফসল উৎপাদনের সুযোগ নেই।

০২. নদীর দুই পার দখল করার ফলে স্রোতধারা ক্ষীণ হওয়া অথবা নদীর মাঝামাঝি বাঁধ দেয়ায় জল প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে উজানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সারা বৎসর ব্যাপী জলাবদ্ধতা এবং কোটি কোটি টাকা মূল্যের ধান এবং অন্যান্য ফসল নষ্ট হওয়া।

পরিদর্শনকৃত এলাকার ঘেরগুোলর আশ-পাশে বসবাস করে এমন সব মানুষের সংগে কথা বলে জানা যায়, এসব ঘেরে এখন আর চিংড়ি চাষ হয়না। চিংড়ি চাষ না হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে।

০১. দীর্ঘদিন একটা চিংড়ি চাষের ফলে ঘের তার উৎপাদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছে।

০২. চিংড়ি চাষের উপযুক্ত করে জমি প্রস্তুত করার জন্যে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে ঘেরের মাটির গুণাগুণ পরিবর্তন হয়েছে।

০৩. লাভজনকভাবে বর্তমানে এখানে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

০৪. সর্বোপরি ঘের মালিকদের প্রধান উদ্দেশ্য চিংড়ি চাষ নয়। চিংড়ি চাষের নামে সহজে খাসজমি দখল করা।

এর ফলে তৈরি হচ্ছে অনেক বড় বড় প্রাকৃতিক পরিবেশগত সমস্যা। এর জন্যে প্রত্যেক্ষভাবে এলাকার স্থানীয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, ঘের মালিকরা জোর করে দখল করে নিচ্ছে ভুমিহীনদের বরাদ্দ পাওয়া খাস জমি। নির্বিচারে ধ্বংস করছে গাছপালা, গৃহপালিত পশু-পাখি যেতে পারছেনা ঘেরের আশ-পাশে সৃষ্টি হচ্ছে ঘের মালিক ভুমিহীনদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। অন্যদিকে নদীগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলছে ঘের এলাকার অনেক দূরের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে। সারা বছরের জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষক জেলেসহ আরও নানা পেশার লোকজন। অথচ একটি সুশৃংখল, সহনশীল পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান জীব বৈচিত্র (ইরড় ফরাবৎংরঃু) প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি বৃত্তীয় সম্পর্কে প্রতিটি প্রজাতি অন্য একটি প্রজাতির উপর নির্ভরশীল। এখানে একটি সাধারণ লতাগুল্ম ও পুরো জীবনচক্রে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। তাই একটি প্রজাতি যখন ধ্বংস হয় তার তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে অন্য একটি প্রজাতির উপর। এবং গোটা পরিবেশের উপর সুদুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। নষ্ট হয় পরিবেশের ভারসাম্য

বাগ্গা নদীর ক্রমশ ক্ষীয়মান স্রোতধারা

নোয়াখালীর হোয়াংহো নোয়াখালী নদী, স্থানীয় জনগণ বলে নোয়াখালী খাল। এই নোয়াখালী নদী সুধারাম থানায় চর বাগ্গায় এসে নাম নিয়েছে বাগ্গা ডোনা। এই বাগ্গা ডোনা নদী দিয়ে সাগরের দিকে গড়িয়ে চলত নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, রামগতির সমস্ত বর্ষা ও বৃষ্টির পানি। এক সময় নদীতে নাব্যতা ছিল, প্রশস্ত নদীর বুকে চলমান স্রোত ছিল। এখন বাগ্গা ডোনাকে দেখলে আর নদী মনে হবে না। একটি ক্ষীণস্রোতা খাল। বুকে জমে আছে পলির পর পলি। চরের অসংখ্য মানুষের জন্য বাগ্গা ডোনা আজ অভিশাপ।

চর বাগ্গার চিংড়ি খামার
বিস্তৃর্ণ জনপদের আতঙ্ক ও অভিশাপ

চর বাগ্গায় চিংড়ি চাষের সূচনা হয় ৯০ দশকের প্রথম দিকে। খামারগুলো শুরু হয় মূলত নদী দখল করে। নদীর দুই পাড়ের জমিতে বাঁধ দিয়ে শুরু হয় এই প্রক্রিয়া। চর বাগ্গা এলাকায় প্রথম চিংড়ি খামার শুরু করে আব্দুল্লাহ মিয়া। এরপর আমির হামজা, চুন্নু মিয়া। ১৯৯৭ সনে লিয়াকত আলী খান, আব্দুল্লাহ মিয়ার কাছ থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকার বিশাল খামার কিনে নেয়। লিয়াকত আলী খান পরবর্তীতে আরও কয়েকটি বাঁধ দিয়ে অবৈধভাবে খামার সম্প্রসারণ করে। বর্তমানে লিয়াকত খানের ঘেরে প্রায় ৪০০/৫০০ একর জমি আছে। এই জমির অধিকাংশই যেমন অবৈধভাবে দখল করা খাস জমি তেমনি এখানে কয়েকজন (প্রায় ১৫ জন) ভূমিহীনের বরাদ্ধকৃত জমি রয়েছে। এইসব ভূমিহীনরা তার ক্ষমতা ও দম্ভের কাছে অসহায়। চর বাগ্গার ভূমিহীন চাষী আলী আহমদ জানায়, আমির হামজার খামারে আজ সে পাহারাদারের চাকরি করে। আবার এই খামার মালিকরাই তা জন্যে বরাদ্দকৃত খাসজমি ভোগ করতে দেয়নি। দখল করে নিয়েছে জোর করে।

শামীম মীর্জার ঘের

চর বাগ্গার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ঘের মালিক আল আমিন মীর্জা। প্রায় ৮/১০ বছর আগে আল আমিন মির্জা দক্ষিন বঙ্গ এগ্রো ফিশারীজ নামে তার চিংড়ি প্রজেক্ট শুরু করে। চর বাগ্গার যে রাস্তাটি এসে বাগ্গা ডোনা নদীর সাথে মিশেছে সে রাস্তার শেষ মাথা থেকে শুরু শামীম মীর্জার ঘের। বেড়ী বাঁধ বরাবর বাম দিকে এগিয়ে গেছে প্রায় যতদূর চোখ যায়। নদীর প্রায় অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে। প্রায় ১০০ মিটারে প্রশস্ততার ঘেরটি দক্ষিন বরাবর এগিয়ে গেছে এক কিলোমিটারেরও বেশি। এক পর্যায়ে আপাতত থেমেছে তার আগ্রাসী থাবা। থেমেছে উপকূলীয় এলাকায় কর্মরত বেসরকারি সংগঠন 'নিজেরা করি' এর নেতৃত্বে সংগঠিত ভূমিহীনদের আন্দোলনের মুখে। যেকোন সময়ই আবার তারা শুরু করতে পারে দখলের কাজ। এই আল-আমিন মীর্জার ঘেরকে কেন্দ্র করে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। ঘটেছে ভূমিহীন এবং শামীম মীর্জাদের মধ্যে মামলা, পাল্টা মামলার ঘটনা। শামীর মীর্জারা এখানে খুবই ক্ষমতাশালী। স্থানীয় বাসিন্দারা আশংকা করছেন তারা আবার আক্রমণের শিকার হবেন। শামীম মীর্জা যে করেই হোক ঘের সম্প্রসারণ করবেই।

জালছেঁড়া নদী : খন্ড খন্ড পুকুর

দুই পাশ দিয়ে দুটি ইউনিয়ন। চর বৈশাখী ও চর ক্লার্ক। তার মাঝখানে বৈশাখী গ্রাম। যে গ্রামের কাছে এসে নোয়াখালী নদী নাম নিয়েছে জালছেঁড়া। এই জালছেঁড়া আজ আর কোনো নদী নয়। জলছেঁড়া মানে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড পুকুর, যে পুকুরে চিংড়ি চাষ হয়। একজন মানুষ নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করবেনা একটা আস্ত নদীকে একুল ওকুল বাঁধ দিয়ে দুটুকরো করে ফেলা যায়। নদীর প্রবাহকে একটি খাল কেটে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এই খাল কাটা হয়েছে ভূমিহীনদেরই বন্দোবস্ত পাওয়া জমিতে, আবার এই খালের স্রোতই ধীরে ধীরে ভাঙছে ভূমিহীনদের ফসলী জমি আর বসত ভিটা। ডাঃ জাফর উল্ল্যার চিংড়ি প্রজেক্ট শুধু স্থানীয় জনগণের জন্য নির্যাতন নয়। সমগ্র নোয়াখালীর মানুষ এর দুর্ভোগের শিকার।

চর সুন্দলপুর
নদীটি ক্রমশ যাচ্ছে চিংড়ি চাষীর পেটে

চর নবগ্রাম ও চর বৈশাখীর সীমানার মাঝখানে সুন্দলপুর, এক ধরনের রুক্ষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে এইসব চর এলাকার, বেড়ি বাঁধের উপর দিয়ে কাঁচা রাস্তা। পাশে বিস্তৃত ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে কিছু ঘর বাড়ি, কিন্তু মানুষের আগ্রাসী থাবায়

ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই সব সুন্দর। এখানে গড়ে উঠেছে ছয়টি চিংড়ি খামার। সেই প্রাচীন পদ্ধতি, খাস জমি, নদীর জলজ ভূমি দখল করে। সুন্দরপুরে ঘের তৈরি শুরু করে একজন তহশীলদার। নাম মমিন উল্ল্যাহ পাটোয়ারী। তার পর আসে হাসেম ডিলার। হাসেম ডিলার করেছে দুটো ঘের সম্পূর্ণ খাস জমির উপর। এখানে আরো দুটো ঘের আছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি তাহের ইঞ্জিনিয়ার এবং ফারুক চেয়ারম্যান এর।

সুন্দলপুরের খামারগুলো নদীর পাশে খাস জমির উপর অবস্থিত। এগুলো এখনও পরিপূর্ণভাবে চাষ শুরু করেনি। এইসব ঘেরসমূহে পাম্পের মাধ্যমে নোয়াখালী নদী থেকে পানি আনা নয়। চিংড়ি খামার করা চরাঞ্চলে জমি দখলের একটি খুবই সহজ ও কার্যকরী উপায়। আর তাই ধারণা করা হচ্ছে সুন্দলপুরের নোয়াখালী নদী অচিরেই একদিন জালছেঁড়ার মতো করুন পরিণতি বরণ করবে।

চিংড়ি চাষের পরিবেশ প্রতিক্রিয়া

পৃথিবীর যেকোন দেশের মতো বাংলাদেশেরও, আবার বাংলাদেশের অন্য যেকোন উপকূলীয় এলাকার মতো নোয়াখালীতেও দেখা যায়, পরিবেশের উপর চিংড়ি চাষের প্রতিক্রিয়ায় এর প্রথম শিকার, স্থানীয় মানুষ, জমি ও পরিবেশ। চিংড়ি চাষের জন্য নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে উপকূলীয় বনভূমি, কৃষি জমি ও জলের উৎস। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের ফলে বনসম্পদ বিলীন, গোচারণ ভূমি হ্রাস, শামুক, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস, জ্বালানী কাঠ, কাশবন, বৃক্ষ নষ্ট, গৃহপালিত পশু-পাখি সংকট ইত্যাদি বিপর্যকর চিত্র। সর্বোপরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার একর কৃষি জমি আর দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ।

চড় বাগ্গার চিংড়ি খামার
পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদীর গতি প্রকৃতি

বাগ্গাডোনা নদী এক সময় ৩০০ মিটার প্রশস্ত ছিল। নদীতে স্বাভাবিক জল প্রবাহ ছিল, কিন্তু চিংড়ি খামারগুলো দখল করে নিয়েছে অর্ধেক নদী। কোথাও কোথাও নদীর বুকে প্রচুর পলি জমেছে। ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হয়েছে, নদী মরে যাচ্ছে। অথচ একটি নদীকে কেন্দ্র করে সজীব ও সতেজ থাকে একটি নির্দিষ্ট এলাকার প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষ। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে, লোকালয়, সভ্যতা। নদীর পানি তারা ব্যবহার করে তাদের প্রত্যাহিক জীবনে। খাদ্য শস্য উৎপাদনে, কৃষিতে, গৃহস্থালীতে, পরিবেশের প্রাণ স্পন্দন টিকিয়ে রাখে একটি নদী। চিংড়ি খামার করার খেসারত দিচ্ছে মানুষ নদীকে মেরে ফেলে। তার প্রকৃতিকে বিপন্ন করে তুলে।

জলাবদ্ধতা

জলাবদ্ধতা সমগ্র বৃহত্তর নোয়াখালীর একটি মৌলিক সমস্যা। নোয়াখালী জেলায় শুস্ক মৌসুমেও দেখা যায় বাড়ির আঙ্গিনার পাশে থিকথিক করছে জল-কাদা। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল উঠে পড়ে প্রধান রাস্তায়। শহরের ভেতর জলাবদ্ধতার একটি কারণ হল ত্রুটিপূর্ণ ড্রেনেজ ব্যবস্থা আর দ্বিতীয় অন্যতম কারণ হল নোয়াখালী খাল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া।

এই নোয়াখালী খালই মূলত নোয়াখালী নদী। নোয়াখালী নদী এখন নোয়াখালী বাসীর জন্য রীতিমতো বিভীষিকা। নোয়াখালী নদী স্থানে স্থানে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। নদীর বুকে পলি জমেছে। কোথাও কোথাও স্রোতধারা খুবই ক্ষীণ হয়ে গেছে। ফলে সহজে পানি সরতে পারেনা।

এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে নতুন উপসর্গ চিংড়ি ঘের। মরার উপর খাড়ার ঘা। এই চিংড়ি ঘেরগুলো মূলত গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। নদী দখল করে। বাগ্গাডোনা নদী এক সময় ৩০০ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত ছিল। আজ এর অর্ধেকের মতো টিকে আছে। এর প্রধান কারণ চিংড়ি ঘের। চিংড়ি ঘেরের নামে ভূমি দখল, নদী দখল। এই বাগ্গাডোনা নদী দিয়ে গড়িয়ে চলে বিস্তীর্ণ এলাকার পানি। চাঁদপুর থেকে শুরু হয়ে রামগতির পাশ দিয়ে নোয়াখালী নদী চর বাগ্গায় এসে হয়েছে বাগ্গাডোনা। এই বাগ্গাডোনা নোয়খালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, রামগতি এই বিশাল এলাকার জলরাশির সমুদ্রে যাবার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। কিন্তু এই পথ আজ মসৃন নয়। এখানে এখন পাষানের মতো পথ আগলে আছে চিংড়ি ঘের। এইসব ঘেরের দেয়ালে এসে বাঁধা পায় প্রবহমান পানি। সরে যাবার পথ না পেয়ে আটকে থাকে বিস্দীর্ণ প্রান্তরে। হাটু জলে ডুবে

থাকে ফসলের মাঠ, সবজি বাগান, বাড়ির আঙ্গিনা। তীব্র খরা যেমন নষ্ট করে ভূমির চরত্রি, তেমনি সারা বছর জমে থাকা জল নষ্ট করে জমির চরিত্র, মাটির গুণাগুণ।

জলাবদ্ধতা ও কৃষি জমি

বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকার অন্যতম প্রধান উপাদান ভাত, আর তাই বাঙ্গালীর উৎপাদিত শস্যের অন্যতম শস্য হল ধান। বাংলাদেশের অবাদযোগ্য জমির দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হয় ধান উৎপাদনে। আবার চরাঞ্চলের জমিগুলির ৯০ শতাংশেই ধান উৎপাদিত হয়। এবং সেখানকার একটি মাত্র শস্য উৎপাদনই চরাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু চিংড়ি এসে থাবা বসিয়েছে এসব প্রায় নিরন্ন মানুষের ভাতের থালায়। চিংড়ি খামারের কারণে কমছে আবাদযোগ্য ফসলী জমি, এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যা আরও প্রকট হয়েছে। নদী দখল করে চিংড়ি ঘের করার কারণে কৃষকের ফসলী জমিতে আটকে থাকছে পানি। ফলে কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। চর বাগ্গার কয়েকজন চাষীর সংগে কথা বলে জানা যায়, খামারের জন্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রায় দুলাখ মানুষ, ফসলী জমি নষ্ট হচ্ছে হাজার হাজার একর। আলী আহমেদ, চর বাগ্গার একজন ভূমিহীন মানুষ। চরের কয়েক টুকরো জমি তিনি বহু কষ্টে বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দখল করতে পারেননি। তার জমিও গেছে এই চিংড়ি খামারের পেটেই। জোতদারের লাঠির নিচে পেতে দিতে হয়েছে তার অসহায় মাথা। এমনি অন্যান্য অনেক ভূমিহীনের মতোই। আলী আহমদ নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে চাকরি করে এই চিংড়ি খামারেই, ঘের পাহারা দেয়ার কাজ।

একটি ১০০ একর জমির খামার থেকে বর্তমানে সর্বোচ্চ বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা আয় হয়। বিপরীতে ১০০ একর জমিতে একর প্রতি গড়ে ৩০ মন ধান উৎপাদিত হলে ধানের মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০০০ মন। প্রতি মন ধানের মূল্য সর্বনিম্ন ২০০ টাকা ধরা হলে ১০০ একর জমি থেকে এলাকার কৃষক আয় করতে পারে ছয় লক্ষ টাকা। এমন শত শত একর জমি দখল হয়ে আছে চিংড়ি চাষের নামে। যা থেকে বর্তমানে চিংড়িও তেমন উৎপাদিত হয়না। ধানও চাষ হয়না। এইসব ঘেরে শুধু জমে আছে বিষাক্ত জল। এর পরোক্ত ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর। চিংড়ি খামারের জন্য রুদ্ধ হওয়া জলপ্রবাহের কারণে নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা এবং এই জলাবদ্ধতার কারণেও নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, রামগতির লক্ষ লক্ষ একর জমির ধান নষ্ট হচ্ছে প্রতিবছর। লক্ষ লক্ষ একর জমি ক্রমেই নিষ্ফলা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সরাসরি দেড় থেকে দুই লক্ষ মানুষ। মাত্র গুটি কতক চিংড়ি খামার মালিকের খুবই সামান্য ব্যক্তিগত লোভের জন্য দেশ বঞ্চিত হচ্ছে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য থেকে, লক্ষাধিক মানুষের জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিসহ।

ভূমির চরিত্র বদল

চিংড়ি চাষের জন্য একবার যে জমি ব্যবহার করা হয় তা পরবর্তীতে আর ফসল উৎপাদনের কাজে আসেনা। জমিটি এক পর্যায়ে চির বন্ধ্যাত্বে রূপ নেয়। তার সমস্ত উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এমনকি এক সময় এতে চিংড়ি চাষও আর হয়না।

একটি চিংড়ি খামার প্রস্তুত করার জন্য প্রথমেই জমির মাটির গুণগত পরিবর্তন আনতে হয়। এই গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োগ করতে হয় নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য। পানির গুণগত পরিবর্তন আনতে হয়। অবাঞ্চিত প্রাণী নিধনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা হয় এবং চিংড়ির রোগ প্রতিরোধের জন্যও রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

চিংড়ি খামারের মাটি ও পানির গুণগত মান
পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত ক্ষতিকর দ্রব্যাদি

ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ইউরিয়া সার/ম্যাগনেসিয়াম, টিএসপি সার/তরল এমোনিয়া, পটাশ সার/এমোনিয়াম কার্বনেট, জিপসাম/ক্যালশিয়াম/এমোনিয়াম নাইট্রেট, এসপি/এমোনিয়াম সালফেট, লবনাক্ত পানি (১৫-২৫ পিপিটি), লৌহ <১.০ মিঃগ্রাম/লিটার

আবার খামার এর মাটি ও পানিকে জীবানুমুক্ত করার জন্য খামার থেকে অন্যান্য অবাঞ্চিত প্রাণী বিনাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন রাসায়নিক ঔষধ। অন্যদিকে চিংড়ির ভাইরাস জনিত ও অন্যান্য নানা রকম রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিকারক

হিসেবে নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়, যেগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। এ ধরনের কিছু ঔষধের নাম নিম্নরূপ :

Parazine (oxolinic Acid), Furasol, Ampicillin, Chlorophenicol, Gentin Violet, Formalin, Potassium permanganate, E.E. mycin, Chloromycetive, Doxycycline

চরাঞ্চলে এইসব খামারগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে এভাবে চিংড়ি চাষের ফলে জমিগুলো আজ যেকোন ধরনের চাষ বাসের জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এই ক্ষতির প্রভাব শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জমিটিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। আশপাশের জমিতেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

চরবাগ্গা, চর বৈশাখীর স্থানীয় জনগণের সংগে কথা বলে জানা যায়, চিংড়ি খামারগুলো থেকে এক সময় প্রচুর অর্থ আয় করেছে সত্য, তবে তার বিনিময়ে হারাতে হয়েছে অনেক কিছু। মূল্য দিতে হয়েছে সীমাহীন। খামারগুলো আজো টিকে আছে।

চিংড়ি চাষ ও ঘের পরিচালনা নীতিমালা ঃ চর বাগ্গা, চর বৈশাখী

১৯৯৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চিংড়ি চাষ ও ঘের পরিচালনা নীতিমালা প্রণীত হয়। এই নীতিমালায় বলা হয়-

- ☐ চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ের চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন করা হবে।
- ☐ থানা পর্যায়ের কমিটি চিংড়ি ঘের লাইসেন্স প্রদান করবে।
- ☐ লাইসেন্স নিতে হলে ঘেরের মালিককে, জমি ব্যবহারের জন্যে জমির মালিককে নির্ধারিত হারে নগদ অর্থ প্রদান করবেন।
- ☐ ইচ্ছুক চিংড়ি চাষী ঘের পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ঘেরের অন্তর্ভূক্ত ৮৫% জমির প্রকৃত ও সরাসরি মালিকদের সম্মতি সূচক একটি চুক্তিপত্র চিংড়ি চাষী ও জমির মালিকদের মধ্যে সম্পাদিত হতে হবে। লিখিতভাবে সম্মতি দেবেন। জমির মালিক। চুক্তিতে হারির টাকা, মেয়াদ এবং অন্যান্য শর্ত উল্লেখ থাকবে
- ☐ চুক্তি রেজিস্ট্রি করতে হবে।
- ☐ লাইসেন্সের জন্য আবেদনের আগেই 'হারি'-র টাকা পরিশোধ করে রশিদের ফটোকপি (ইউপি চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড সদস্যের স্বাক্ষর এবং সিল সম্বলিত) জমা দিতে হবে।
- ☐ ঘেরের মেয়াদ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে।
- ☐ ধান চাষের জন্যে জমি থেকে নোনাপানি নিষ্কাশনের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘের মালিক ও জমির মালিকের মধ্যে সম্পাদিত হবে।
- ☐ জেলা ও থানা পর্যায়ের চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি করে তবেই ঘের মালিকের লাইসেন্স নবায়নযোগ্য।

উপরোক্ত নীতিমালা কাগজে-কলমে আছে সত্যি কিন্তু ঘের মালিকরা এটিকে তোয়াক্কা করেন বলে মনে হয় না।

নোয়াখালীর চরাঞ্চলে সরেজমিন পরিদর্শন এবং স্থানীয় জনগণের সংগে কথা বলে জানা যায়, এখানে নীতিমালা বলে কিছু নেই, পেশীশক্তির জোরে দখল করে নিচ্ছে খাস জমি, নদীনালা, এমনকি বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমিহীনের জমি, দুর্নীতির মাধ্যমে দলিলপত্র তৈরি করছে আবার অনেকেই দলিল করারও প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন না। আবার কিছু চিংড়ির জন্যে বরাদ্দ পাওয়া জমির খাজনা দিচ্ছে সাধারণ কৃষি জমির মতো। এতে করে সরকার বঞ্চিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে। ব্যাপক পরিবেশ ধ্বংসকারী চিংড়ি চাষ এর জন্য যেটুকু দুর্বল নীতিমালা রয়েছে তার সামান্যতম ব্যবহারও নেই।

বৃক্ষ

মানুষের জীবনের এক অন্যতম অনুসঙ্গ 'বৃক্ষ'। বৃক্ষের কাছ থেকেই মানুষ যুগে যুগে সংগ্রহ করেছে তার বেঁচে থাকার, জীবন-যাপনের রসদ, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এক ব্যাপক অংশ জুড়ে বৃক্ষ সম্পদের ব্যাবহার। একটি প্রবাদ আছে

WHERE THERE IS TREE, THERE IS LIFE

WHERE THERE IS NO TREE, THREE IS NO LIFE

নোয়াখালীর চরাঞ্চলে চিংড়ি ঘের আছে এমন এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায় এমনি বৃক্ষহীনতার চিত্র, নিষ্প্রাণ জীবনের চিত্র। প্রথমত চিংড়ি চাষের জন্যে উজাড় করা হয়েছে বনজ সম্পদ। দ্বিতীয়ত চিংড়ি চাষের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে বদলে গেছে মাটির চিত্র; চরিত্র। চিংড়ি ঘের এলাকার আশ-পাশে আজ আর জন্ম নেয় না সবুজ বৃক্ষপত্র অথবা ফলবান গাছ। বেড়ি বাঁধের দুইপাশে লাটিবন ছাড়া অন্য কোনো বৃক্ষ খুব একটা চোখে পড়েনি। দৃষ্টিহীনতা এলাকায় মরুময় পরিবেশ সৃষ্টি করছে

পশু সম্পদ

আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের মানুষজনকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে প্রকৃতির অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এই নির্ভরশীলতার একটি অংশ তাদের হাঁসমুরগী, গরু-ছাগল। এই হাঁস-মুরগি গরু ছাগলকেও বেড়ে উঠতে হয় খাদ্যের প্রাকৃতিক উৎসের উপর। চিংড়ি খামার একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছে এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস। দ্বিতীয়ত খামারের আশ-পাশে বসবাস করে এমন কয়েকজন ব্যক্তি বলেছেন তাদের হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল কোনভাবে খামার এলাকায় গেলে সেগুলিকে ধরে নিয়ে যায় খামারের লোকজন। সব মিলিয়ে পশুসম্পদ জন্ম ও প্রতিপালনের হার এলাকায় দিন দিন কমছে।

জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী
বিপন্ন জীব-বৈচিত্র

প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্ভর করে একটি বৃত্তীয় সম্পর্কের উপর। সেখানে একটি লতাগুল্ম অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রতিটি প্রজাতি কোননা কোনভাবে অন্যটির উপর নির্ভরশীল, তাই একটি প্রজাতি যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তার প্রভাব পড়ে অন্য একটি প্রজাতির উপর, গোটা পরিবেশের উপর। চিংড়ি খামার করতে গিয়ে ব্যাপক এলাকার নানা রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস করা হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে গোটা পরিবেশে। ছোট প্রজাতির মাছ এক রকম বিলীন। নানা রকম প্রাকৃতিক জলজ গুল্মলতা এখন আর দেখা যায় না।

সামাজিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় মানুষের বসবাস, গৃহস্থালী আর সামাজিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরূপ হলে দুর্বিসহ হয়ে উঠে মানুষের জীবনযাপন। তৈরি হয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ। নোয়াখালীর চরাঞ্চলের চিংড়ি খামার বিষিয়ে তুলেছে স্থানীয় মানুষের জীবন। স্থানীয় মানুষ যাদের সংগে কথা বলা হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই বলেছেন, বেশির ভাগ খামারেই এখন আর চিংড়ি চাষ হয়না, কিন্তু অব্যাহত আছে চিংড়ি চাষের নামে জমি দখল, নদীদখল প্রক্রিয়া। এবং এর ফলে তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই তাদের দাবী লোকালয়ে যেন খামার করতে দেয়া না হয়।

কৃতজ্ঞতা :

১) নিজেরা করি, নোয়াখালী অঞ্চলের কর্মীবৃন্দ।

২) ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি), নোয়াখালী কার্যালয়।

সৌজন্যে ঃ ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)